গ্রিনহাউসের ভূত

রকিব হাসান

সম্প্রীতি প্রকাশ

সূচি

গ্রিনহাউসের ভূত ○ ৭
পিশাচের আতঙ্ক ○ ২৯

গ্রিনহাউসের ভূত

'কিশোর, বাগান আর পুকুর সহ গ্রামের ভিতরে ছোট্ট একটা গ্রিনহাউস কিনলে কেমন হয়?' রাশেদ পাশা জিজ্ঞেস করলেন।

'ভালই হয়, চাচা,' সাবধানে জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু গ্রিনহাউস কেনার শখ হলো কেন তোমার হঠাৎ?'

'সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কিনতে চাইছে না। তাই ভাবলাম, আমি ওটা কিনে রাখি। পরে সুযোগ-সুবিধেমত বেশি দামে বেচে দেব,' চাচা বললেন।

'ঘটনাটা কী, চাচা? তোমার কথায় রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'ধরে ফেলেছিস,' হাসলেন চাচা। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। রহস্য একটা আছে। ভূতুড়ে রহস্য। সেজন্যই বিক্রি হচ্ছে না বাড়িটা। আমি কেনার পর গ্রিনহাউস ভূত রহস্যটার সমাধান করতে হবে প্রথমে। তারপর বিক্রি।'

'তা-ই বলো,' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। 'তারমানে ওখানে একটা ভূত আছে। তা রহস্যটা কী, খুলে বলো তো।'

রাশেদ পাশা জানালেন, কিছুদিন হলো বাড়ির মালিক মারা গেছেন। সুন্দর সুন্দর অর্কিডের চাষ করতেন তিনি। 'মোজিলা অর্কিডের নাম শুনেছিস?'

'শুনেছি। আজকাল বিয়েতে ওই ফুলের তোড়া খুব ব্যবহার হয়। এখনকার বিয়ের কনেরা মোজিলা অর্কিড ভালবাসে।'

'ঠিক,' রাশেদ পাশা বললেন। 'মিস্টার মোজিলার নামেই মোজিলা অর্কিডের নাম হয়েছেন। তিনি আর তাঁর স্ত্রী মিলে খুব ভাল ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন। তারপর হঠাৎ শুরু হলো ঝামেলা। কারা যেন তাঁদের কাঁচ ভাঙতে লাগল, বাজারে পাঠানোর জন্য রেডি করে রাখা ফুল চুরিও করতে লাগল, নষ্টও করতে লাগল। ভয়ানক করে তুলল পরিস্থিতি। হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন মিসেস মোজিলা। এর কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীর পথ ধরলেন স্বামীও। একবার ওই বাড়ি থেকে কিছু পুরানো মাল কিনেছিলাম, সেই থেকেই ওদের সঙ্গে পরিচয়। ওদের ছেলেমেয়েরা শহরে থাকে। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। গ্রিনহাউসে ফুলের ব্যবসায় যেতে চায় না। তা ছাড়া বাড়িটার একটা কুখ্যাতিও হয়ে গেছে। লোকে বলে ওখানে ভূত আছে, ভূতেরাই ওসব কুকর্মগুলো করছে।'

'লোকে তো এমনই। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলেই, ভালমত তলিয়ে না দেখে ভূতের ওপর দোষ চাপায়,' কিশোর বলল। 'বিষয়টা আমার কাছেও বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। তবে আমি ভয় পাই না। তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

চাচা-ভাতিজা বেরোতে যাবে, এই সময় সেখানে এসে হাজির কিশোরের কুকুর টিটু। প্রথমে কুঁই কুঁই করল, তারপর ঘাউ ঘাউ করে চেঁচাতে লাগল।

'কি রে টিটু, তুইও যেতে চাস,' বলল কিশোর। বাইরে এসে গাড়ির দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে লাফিয়ে উঠে বসল টিটু। ওকে পিছনের সিটে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসল কিশোর। রাশেদ পাশা বসলেন ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি চালালেন তিনি। কিশোরের সঙ্গে অর্কিড নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। রাশেদ পাশা বললেন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অনেক দেশেই আজকাল অর্কিডের চাষ হয়। তবে সবার আগে এটা আবিষ্কার হয়েছিল মালয়েশিয়ায়। 'ওখান থেকেই কয়েক ধরনের অর্কিড নিয়ে এসেছিলেন মিস্টার মোজিলা। তারপর গ্রিনহাউস বানিয়ে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ

শুরু করেন।'

'আমাদের স্কুলের মালীর কাছে শুনেছি,' কিশোর বলল, 'গোপনে নাকি গাঢ় নীল এক ধরনের অর্কিড ফোটানোর চেষ্টা করছিলেন মিস্টার মোজিলা। কাজটাতে প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিলেন, এ সময় হঠাৎ করে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

'তাই নাকি?' অবাক হলেন রাশেদ পাশা। 'আমিও তো জানি বিষয়টা। গোপন ব্যাপারটা তারমানে আর গোপন থাকেনি। কিন্তু মোজিলার ছেলেমেয়েরা জানে বলে তো মনে হলো না।'

কিছুক্ষণ পর গ্রিনহাউসের গেটের কাছে পৌঁছলেন রাশেদ পাশা। দুটো পাথরের পিলার দেখতে পেলেন। একটাতে খোদাই করে লেখা রয়েছে বাড়িটার নাম, 'অর্কিডিয়ানা'। গেট দিয়ে একটা ছায়াঢাকা ড্রাইভওয়েতে ঢুকে গাড়ি থামালেন রাশেদ পাশা।

জায়গাটাকে ছবির মত সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন মোজিলারা। চাষ করা ফুল তো রয়েছেই, এখানে ওখানে অসংখ্য বুনো ফুলও বাতাসে দোল খাচ্ছে। দেখে মুগ্ধ হলো কিশোর। বাড়িটার দিকে তাকাল।

'চাচা, তুমি তো বলেছিলে ছোট্ট বাড়ি!' কিশোর বলল। 'কিন্তু এখন তো দেখছি প্রাসাদ। শুধু জানালাগুলো পরিষ্কার করতেই এক সপ্তাহ লেগে যাবে।'

রাশেদ পাশা জানালেন, সারা বাড়ি জুড়ে বাস করেননি মোজিলা দম্পতি। শুধু মাঝখানের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। বাড়ির একটা প্রান্তকে বানিয়েছিলেন অর্কিডের শোরুম। অন্যপ্রান্তে মালীরা থাকে।

মালী যে আছে সেটা জানান দিতেই যেন ঠিক ওই মুহূর্তে বাঁ-প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। বেঁটে, গোলগাল, কালো চুলওয়ালা লোকটা কাছে এসে নিজের পরিচয় দিল হেনরি স্মিথ বলে।

'আমি কিশোর পাশা, আর উনি আমার চাচা রাশেদ পাশা,' জবাব দিল কিশোর। 'দারুণ সুন্দর জায়গা। পুরোটা ঘুরে দেখার জন্য তর সইছে না আমার।'

'আমি বড় গ্রিনহাউসটায় যাচ্ছি,' মালী বলল। 'ওটা আগে দেখতে চাও, নাকি বাড়িটা?'

চাচার দিকে তাকাল কিশোর। মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'গ্রিনহাউসেই যেতে চাই,' মালীর দিকে ফিরে বলল কিশোর। 'যেতে যেতে ভূতটার ব্যাপারে যা যা জানেন, আমাকে বলুন।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মালী। কিশোরের মনে হলো কাপড়ের নীচে লোকটার কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকি খেল। কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বলল না লোকটা। তারপর যেন নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিল, 'ও, গুজবটা তারমানে শুনেছ? ওসবে কান দিয়ো না। গুজব গুজবই। ফালতু। গ্রিনহাউসে ভূতটুত কিছু নেই।'

আর কিছু বলল না কিশোর। চাচার সঙ্গে লোকটাকে অনুসরণ করল ও। মস্ত একটা গ্রিনহাউসের কাছে এসে দাঁড়াল। গম্বুজ আকারের একটা বাড়ি, পুরোটাই কাঁচের তৈরি। কোথাও ভাঙা দেখা গেল না। নিশ্চয় মেরামত করে ফেলা হয়েছে।

স্মিথের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুজনে। সঙ্গে সঙ্গে সামনে এগিয়ে এল একজন অল্পবয়েসী লোক। স্মিথ পরিচয় করিয়ে দিল, 'ও ডিডি। আমার সহকারী।'

নাম শুনে লোকটাকে হাওয়াইয়ের অধিবাসী মনে হলো কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি পলিনেশিয়ান? ওখান থেকে আমেরিকায় এসেছিল আপনার পূর্বপুরুষরা?'

'হ্যাঁ,' লোকটা জানাল।

সুন্দর ফুলগাছের সারির মাঝখান দিয়ে চাচার সঙ্গে এগোল কিশোর। বাতাসে নাক টানতে টানতে কিশোর বলল, 'এত মিষ্টি গন্ধ কীসের? নিশ্চয় অর্কিডের নয়?'

'নাহ্। আমরা কয়েক জাতের গোলাপের চাষও করি এখানে,' ডিডি জবাব দিল। 'স্থানীয় ফুলের বাজারে বিক্রি করি ওগুলো।'

সারির শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল। ওপাশে ঘর আছে। দরজায় একটা সাইনবোর্ড ঝোলানো, তাতে লেখা : প্রবেশ নিষেধ।

'ওখানে কী আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

রকি বিচে ফিরে লোমাক্স বিউটি স্যালুনের সামনে এসে চাচাকে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। গাড়ি থেকে নেমে স্যালুনে ঢুকল।

'কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল কাউন্টারে দাঁড়ানো মহিলা।

'একটা পরচুলা ভাড়া করতে চাই, সাদা রঙের, যেটা একজন তরুণী মহিলাকে দিয়েছেন আপনারা,' কিশোর বলল। 'কোন ধরনের পরচুলা, বলছি। রেজিস্টার দেখুন। নম্বরটা হলো ২৩লোমাক্স ১০৯।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না,' মহিলা বলল। 'তরুণীর নাম কী?'

'জানি না। একটা থিয়েটারের পিছনের সাজঘরে গিয়ে পরচুলাটা দেখেছি আমি।'

একটা বাক্সে রাখা কার্ডে আঙুল চালাল মহিলা। দেখে দেখে একটা কার্ড টেনে বের করল। 'এটা একটা স্পেশাল অর্ডার। তুমি যদি চাও, তাহলে তোমাকেও একটা বানিয়ে দেয়া যাবে।'

'বানাতে কত সময় লাগবে?' জানতে চাইল কিশোর।

'দুই সপ্তাহ। তবে একটা পরচুলা সম্ভবত স্টকে আছে, ভাড়া দেয়ার মত।'

গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর। মহিলার হাতের কার্ডে লেখা নামটা দেখল। অবাক হলো না। কার্ডের কোণায় লেখা রয়েছে 'স্মিথ'। তারমানে ওর ধারণাই ঠিক। স্মিথরা স্বামী-স্ত্রী মিলেই কাজটা করছে। ভূত সেজেছে মিসেস স্মিথ।

'ভাড়া নেব না নতুন একটা নেব, আমি আপনাকে জানাব।' তারপর মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

চাচার কাছে ফিরে এল ও। মাথায় ভাবনার ঘূর্ণি। রহস্যটা নিয়ে

ভাবছে। হঠাৎ করেই নতুন আরেকটা বুদ্ধি এল তার মাথায়।

রকি বিচ শহরে ঢুকে প্রথমে লোম্যাক্স বিউটি স্যালুনের সামনে গাড়ি থামাল ও। ভিতরে ঢুকল। কাউন্টারে বসে থাকা মহিলাকে বলল, সাদা পরচুলাটা ভাড়া চায়। সঙ্গে একটা পরিচারিকার পোশাক। হালকা গোলাপি রঙের একটা পোশাক পাওয়া গেল। এতেই চলবে। জিনিসগুলো প্যাক করে দিতে বলে, ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিল। ফিরে এল গাড়িতে।

মুসা আর রবিনকে ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে এল কিশোর। গাড়ি রেখে ঘরে ঢুকে সোজা নিজের বেডরুমে চলে এল। আলমারি খুলে ছোট একটা ব্যাগ বের করল। তাতে ভরে রাখল প্যাকেটটা।

খাওয়া শেষ করে ব্যাগটা নিয়ে আবার বেরোল ও। আবার বাড়ি থেকে তুলে নিল মুসা ও রবিনকে। ফিরে চলল অর্কিডিয়ানায়। কী করতে চায়, জানতে চাইল ওর দুই সহকারী।

কিশোরের উদ্দেশ্য আর প্ল্যানটা শোনার পর রবিন বলল, 'তুমি শিওর হচ্ছ কী করে যে গ্রিনহাউসের ভূতটা লনে বেরোবেই?'

'যদি না বেরোয়, তো ওটাকে কৌতূহলী করে টেনে বের করে আনার দায়িত্ব তোমার,' কিশোর বলল।

গোধুলি বেলায় পরচুলা আর গাউন পরে গ্রিনহাউসের দিকে চলে গেল গেল কিশোর। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন। অবশেষে সাদা চুলওয়ালা ভূতটা বেরিয়ে এল বাইরে, হাতে একটা শিশি, তাতে গাঢ় রঙের কোনও জিনিস। লনে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করল ভুতটা, মুখখোলা শিশি থেকে তরল পদার্থ ছলকে পড়তে লাগল

ঘাসের ওপর।

এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে মূর্তিটা, লক্ষ্যহীনভাবে। গ্রিনহাউসের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে বসে কিশোরও দেখতে পাচ্ছে। ওর মনে হলো, বেরোনোর সময় হয়েছে। লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে বেরিয়ে এল লনে। ভূতটাকে নকল করে সে-ও নাচতে নাচতে চলে এল লনের মাঝখানে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে, দুই হাত সামনে বাড়িয়ে, ভয়ঙ্করভাবে গুঙিয়ে উঠল, যেন আরেকটা ভূত।

ঘুরে তাকাল সাদা ভূতটা। কিশোরকে দেখে ভয়ানক এক চিৎকার দিয়ে ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। তৈরিই ছিল মুসা আর রবিন। জানালার কাছ থেকে ছুটে এসে হলঘরের সিঁড়ি আগলে দাঁড়াল।

'গুড ইভনিং, মিসেস স্মিথ,' হাসিমুখে বলল রবিন।

তার সঙ্গে যোগ করল মুসা, 'আপনি খুব ভাল নাচতে পারেন।'

বিস্ময় আর ভয় একসঙ্গে খেলে গেল মহিলার মুখে। 'তোমরা, তোমরা আমাকে চেনো?'

এ সময় সামনের দরজা দিয়ে ঢুকল কিশোর। নাচের ছন্দে হাঁটার সময় ওর ঢোলা গাউনটা এমনভাবে ঝাঁকি খেতে লাগল, অস্পষ্ট আলোয় মনে হলো পায়ে হেঁটে নয়, বাতাসে ভেসে ভেসে ঢুকছে ও।

'আপনার খেলা শেষ, মিসেস স্মিথ,' কিশোর বলল। 'আপনি আর আপনার স্বামী মোজিলার গোপন ফর্মুলাটা চুরি করে আরেকটু হলেই পার পেয়ে যাচ্ছিলেন। আপনার ভূতের নাটক মানুষকে ভয় দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল...আর এই সুযোগে ফর্মুলার শেষ অংশটাও গবেষণা করে শেষ করে আনছিলেন আপনারা। কাজটা শেষ হয়ে গেলেই বিক্রি করে দিয়ে পুরো টাকাটা নিয়ে কেটে পড়তেন।'

'উঁহুঁ, চুরির কথাটা ঠিক নয়,' মহিলা বলল। 'মিস্টার মোজিলা মৃত্যুর আগে ফর্মুলাটা আমাদের দান করে দিয়ে গেছেন।'

'বেশ, সেটা আদালতে গিয়েই প্রমাণ করবেন,' কিশোর বলল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিসেস মোজিলার মুখ।

এই সময় ওদের কথায় বাধা দিল ডিডি। হঠাৎ করেই ঘরে ঢুকল। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল ভূত দুটোর দিকে। অবশেষে চিনতে পারল কিশোরকে।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিশোরের হাত চেপে ধরল। 'আমি ওটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। এসো, দেখে যাও।'

ডিডির পিছন পিছন এসে গ্রিনহাউসে ঢুকল কিশোর। গর্বিত ভঙ্গিতে হাত তুলে দেখাল ডিডি। একটা সুন্দর নীল অর্কিড ফুটে থাকতে দেখা গেল।

'বাহ্, ভীষণ সুন্দর তো!' অবাক হয়ে ফুলটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'কী করে করলেন?'

'রঙের মিশ্রণটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তখন, হঠাৎই মনে পড়ল,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে জবাব দিল ডিডি। 'তবে এবার ভুললেও আর অসুবিধে হবে না। দেখো, লিখে রেখেছি। ফর্মুলার শেষ অংশটা আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর এটা নিয়ে গর্ব করতে পারেন আপনি,' হেসে বলল কিশোর। 'এ বাড়ির পরের মালিক যে হবে, সে আপনাকে চাকরিতে রেখে দেবে, বেশি বেতন দিয়ে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই আমার।'

'শুনেছি, পরের মালিক তোমার চাচাই হবেন,' ডিডি বলল।

'হতে পারে।'

'চাকরিতে থাকতে আমার কোন আপত্তি নেই,' ডিডিও হাসল। 'তবে এক শর্তে, লনের মধ্যে ভূতের নাচন আর চাই না। ওসব দুষ্ট জিনিসগুলোকে তাড়াতে হবে এখান থেকে।'

পিশাচের আতঙ্ক

আজব এলাকায় যেতেই বিপদের মুখোমুখি কিশোর। আরেকটু হলেই নরখাদকের হাতে প্রাণটা গিয়েছিল ওর!'

ওর কথায় অবাক হলো মুসা। 'কি যে বলো না। এখানে নরখাদক আসবে কোত্থেকে?'

'এসেছে বলেই তো বলছি। বিলি অবশ্য আগেই হুঁশিয়ার করেছিল আমাকে। নইলে ঠিক মারা পড়তাম।'

'তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। ও তোমার বন্ধু হলো কি করে? চান্স পেলেই তো খেপায়।'

'বন্ধু হয়নি। একটা চাকরি দিয়েছে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। বিলিকে ভাল করেই চেনে। ভাল নাম বিলিয়ার্ড রেইনার, কিশোরদের পড়শী। আগে গাঁয়ের কিনারে অন্য একটা বাড়িতে থাকত, কিছুদিন হলো ওখান থেকে চলে এসেছে। একই স্কুলে পড়ে ওরা, তবে বিলি ওপরের ক্লাসে। বয়েসও তিন-চার বছর বেশি। কিশোর ওকে দেখতে পারে না। ওপরের ক্লাসে পড়ে বলে দেমাগ দেখায়। কি করে যেন জেনে গেছে ভূতকে ভয় পায় কিশোর। তারপর থেকে খেপায়। সুযোগ পেলেই ভূতের ভয় দেখায়। ইদানীং হাতখরচের টাকা রোজগারের জন্যে খবরের কাগজের হকারি করে।

'দুদিন ছিলাম না,' মুসা বলল, 'এর মধ্যেই এত কাণ্ড ঘটে গেল! খুলে বলো তো ঘটনাটা কি?'

‘তুমি যাওয়ার পরদিন এসে আমাকে ধরল বিলি,’ কিশোর বলল। ‘মিনতি শুরু করল— আমার একটা কাজ করে দিবি, ভাই? জিজ্ঞেস করলাম, কি কাজ? বলল, আমি পনেরো দিন থাকব না। বেড়াতে যাব। অতদিন কাগজ না পেলে সহ্য করবে না গ্রাহকরা, অন্য হকার ঠিক করে নেবে। তুই যদি কটা দিন চালিয়ে নিতে পারিস, তো আমার গ্রাহকগুলো থেকে যায়। ওই পনেরো দিনের লাভের টাকাটা নাহয় তুই নিয়ে নিস।’

‘রাজি হলে?’

‘এমন করে ধরল, না করতে পারলাম না। তা ছাড়া, পঞ্চাশ ডলার পাব। অনেক টাকা। গরমের সময় মেলায় গিয়ে দুহাতে খরচ করতে পারব। সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করল না।’

‘তারপর?’

‘আমি রাজি হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বিলি। কার কার বাড়িতে কাগজ পৌঁছে দিতে হবে তার একটা লিস্ট দিল আমাকে। নিচের শেষ নামটা দেখিয়ে বলল— তুই যখন আমার কাজটা করতে রাজিই হলি, কিশোর, তোকে সাবধান না করে পারছি না; খবরদার, এই বুড়ো সন্ন্যাসীটার ব্যাপারে সাবধান থাকবি। কোনমতেই যেন তোকে ধরতে না পারে!’

‘অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমাকে জিজ্ঞেস করল, দেখেছিস ওকে? মাথা নাড়লাম। দেখিনি। চোখ বড় বড় করে বলল সে, লম্বা দাড়ি বুড়োটার। বাদামী দাঁত, হলুদ চোখ। হাতের আঙুলগুলো, জানিস, ঈগলের নখের মত বাঁকা। ও মানুষ খায়।

‘বললাম, ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?

‘না না, তা দেখাব কেন? আধহাত জিভ বের করে কামড়ে ধরল বিল। বুড়োটা যাতে তোর কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে তোকে সাবধান করা। তুই আমার কাজটা না করে দিলে অবশ্য করতাম না। তখন ভাবতাম, ধরুক তোকে, মর্‌গে, আমার কি?

‘সেদিন বিকেলের বাসে চলে গেল সে।

পরদিন ভোরে সাইকেলের ক্যারিয়ারে খবরের কাগজের বোঝা

দৌড় দেয়ার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে কিশোরের। কিন্তু কথা শুনছে না যেন পা। অনড় হয়ে গেছে।

এগিয়ে আসছে শুঁয়া-মানব। ভয়াল দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে। কামড় মারল বাতাসে। শব্দ হলো, কঁচাক!

ঘোরের মধ্যে যেন অনেক কষ্টে একটা পা টেনে তুলল কিশোর। তারপর আরেকটা। পিছিয়ে গেল এক পা।

এগিয়ে আসছে ওটা।

দৌড়াতে শুরু করল সে। ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে।

গতি বাড়িয়ে দিয়েছে দানবটা। শুঁয়াপোকার মত পিঠ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে বুকে হেঁটে ছুটে আসছে।

সাইকেলের কাছে পৌঁছল কিশোর। হ্যান্ডেল ধরে ঠেলা দিয়ে স্ট্যান্ড থেকে নামাল। প্যাডেলে পা রেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চেন গেল খুলে।

খোলার আর সময় পেল না! তাড়া থাকলেই খোলে বেশি, বহুবার দেখেছে সে।

কঁচাক! কঁচাক!

ফিরে তাকাল সে।

বিশাল হাঁ করে রেখেছে দানবটা। দাঁত বেরিয়ে আছে। কিশোর তাকাতে আবার কামড় মারল বাতাসে।

কঁচাক!

ওই ভয়ঙ্কর দাঁতের আওতায় পড়লে কি অবস্থা হবে, কল্পনা করতে চাইল না কিশোর। চেন লাগাতে বসল। পেছনের চাকাটা উঁচু করে, ব্রেকেটে চেন বসিয়ে প্যাডেল ঘোরাল।

পেছনে তাকানোর সময় নেই। বুঝতে পারছে, আসছে ওটা।

মোটা তুলতুলে শরীর মাটিতে ঘষা লাগার শব্দ হচ্ছে।

ঠিকমত বসেনি চেন। প্যাডেল ঘোরাতেই কাঁটা থেকে খুলে পড়ে গেল আবার।

ওহ্, খোদা!

ফিরে তাকানোর সাহস হচ্ছে না আর। কতটা কাছে চলে এসেছে দেখতে চায় না কিশোর। শুনতে পাচ্ছে ওটার এগিয়ে আসার শব্দ।

আবার ব্রেকেটে বসাল চেন। প্যাডেল ঘোরাল।

টানটান হয়ে গেল চেন, ঘুরতে শুরু করল পেছনের চাকা।

বসেছে।

হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলা দিয়ে একলাফে সীটে চড়ে বসল সে। একেবারে কাছে চলে এসেছে দানবটা। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ নাকে আসছে। মাংস পচা তীব্র গন্ধ।

ফিরে তাকাল কিশোর।

বিকট হাঁ করে কামড় বসাল দানবটা।

কঁচাক!

অল্পের জন্যে মিস করল কিশোরের পা। আবার হাঁ করল।

প্রাণপণে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে কিশোর। সরে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। কঁচাক কঁচাকও পেছনে পড়ছে।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ। হাঁপ ছাড়ল ও।

বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকল কিশোর। বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল, মুসা কি বলবে? এবারও হাসাহাসি করবে? বলবে মতিভ্রম ঘটেছিল ওর?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর।

ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। বাগানের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এসে নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইল না যে দানবের পাল্লায় পড়েছিল। ভাবল, আচ্ছা, এমন হয়নি তো, কাগজ দেয়া শেষ করে নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছি আমি? শোয়ার পর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে ঘটেছে ঘটনাটা?

কিছুক্ষণ পর মুসা এল। জিজ্ঞেস করল, 'আজ কিছু দেখেছ?'

'বিশ্বাস করবে না।'

চিৎকার করেছে একটা কুকুর। কুকুরের ডাক অনেক শুনেছে কিশোর, কিন্তু এ রকম আর শোনেনি। ওর মনে হলো নরক থেকে ডেকে উঠেছে কোন ভয়ানক পিশাচ। দেখতে পেল না ওটাকে।

হকিনসদের বাড়িতে কুকুরের ডাক, তারমানে নিশ্চয় কমান্ডার। আর কোন কুকুর নেই ওদের। মোলায়েম স্বরে ডাক দিল, 'কমান্ডার! লক্ষ্মী ছেলে! কোথায় তুই?'

জবাব দিল না লক্ষ্মী ছেলে। বেরোলও না আড়াল থেকে।

পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করল কিশোর। কুকুরটার আচরণ সেদিন মোটেও সুবিধের মনে হয়নি। আজও কি ওরকমই করবে?

শোনা গেল চাপা গরগর।

না, স্বাভাবিক শব্দ নয়! ওটা বেরোনোর আগেই পিস্তলে পানি ভরে নেয়ার তাগিদ অনুভব করল সে। পানি নিয়ে কেটে পড়া উচিত।

কলের দিকে পা বাড়াল কিশোর। এক পা এগিয়ে থেমে গেল।

জোরাল হলো গরগর।

আরেক পা বাড়াল কিশোর।

খাবারের খালি টিনের একটা স্তূপের ওপাশ থেকে উঁকি দিল কমান্ডারের মাথা। দাঁত খিঁচিয়ে রেখেছে। বেরিয়ে আছে লম্বা, চোখা দাঁতগুলো। অস্বাভাবিক দাঁত। সাধারণ কুকুরের এমন হয় না।

অনেক বড় লাগছে ওকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এত বড় নয় সে। ওর ভাবভঙ্গিতে কুকুরের চেয়ে বরং নেকড়ের স্বভাব এখন প্রকট। তারমানে গেছে ওটাও ভূত হয়ে।

খুদে ইবলিসটা তার কাছে না আসার কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর। ঝোপের ভেতরে তাকে দেখেছে ওটা ঠিকই। আক্রমণ

'এখন নিশ্চয় মোছা দেখে অবাক হবে। যাই হোক, আরেকটা কথা, ডুয়েনের বদনাম করল কেন?'

'ভেবেছে, কোন অঘটন যদি ঘটে যায়, সন্ন্যাসীকে সন্দেহ করবে লোকে, সে বেঁচে যাবে। গাঁয়ের লোকে ডুয়েনকে এমনিতেই একটু অন্য চোখে দেখে।'

'বিলি শয়তানটাকে ধরে একটা ধোলাই দেয়া দরকার!' দাঁতে দাঁত চাপল কিশোর।

'না, ধোলাই নয়। ভাবছি, ওর ওষুধই ওকে ফিরিয়ে দেব।'

'মানে?'

'আমরাও ওকে ভূতের তাড়া খাওয়াব।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'ভূত কি রেডি হয়ে আছে নাকি তোমার জন্যে?'

'আছে,' বুঝে ফেলেছে মুসা। চোখ বড় বড় করে বলল, 'হেক্স সাইন এঁকে রেখে এলেই হবে। কার বাড়িতে আঁকবে, রবিন?'

'অন্যের নয়, আমাদের নিজেদের বাড়িতেই। যার যার ঘরে।'

আঁতকে উঠল কিশোর, 'বলো কি! নিজেরা নিজেদের ভূত বানাব?'

'অসুবিধে কি? বইটাতে ভূত বানানোর কায়দা-কানুন সব লেখা আছে। বিলি যদি বই দেখে কাজটা করতে পারে, আমরা পারব না কেন? তবে নিরীহ ভূত হব আমরা, একেবারেই নিরীহ, যাতে আবার খুনটুন করে না বসি। শুধু বিলিকে একটু ভয় দেখানো, ব্যস, আর কিছু না।'

'কিন্তু,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'আমাদের ভূত ছাড়াবে কে?'

'আমরাই ছাড়াব। এক রাতের জন্যে ভূত হব। কাল ভোররাতে বিলিকে ভয় দেখানো হয়ে গেলে সকালেই সাইন মুছে ফেলব।'

ভোররাতে কাগজ দিতে বেরিয়ে তিন গোয়েন্দার ভূত দেখে বিলির কি অবস্থা হবে, কল্পনা করে হো হো করে হেসে উঠল কিশোর। বলল, 'হ্যাঁ, এইটাই ওর মত শয়তানের উপযুক্ত শাস্তি। আমাকে খালি প্যান্ট খারাপ করার কথা বলে তো, আজ ওর প্যান্ট খারাপ না করিয়ে আমি ছাড়ব না। জীবনে আর আমাদের সঙ্গে ওস্তাদি করতে আসবে না।'

অন্য দুজনও হাসতে লাগল।